BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02110019
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 11| December 2024| e-ISSN: 2584-1890

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্পে— দেশভাগের যন্ত্রণা আর বাংলার মন্বন্তরের মর্মভেদী সুর

স্বাগতা বিশ্বাস

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University Ranchi, Jharkhand

সার সংক্ষেপ:

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একাধারে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং একজন ছোটগল্পকার। 'লালসালু' (১৮৪৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪), 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) নামের তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আমাদের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আধুনিক উপন্যাসের অস্তিত্ববাদী, চেতনাপ্রবাহ রীতির সুচারু প্রয়োগ তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে। নাট্যকার হিসেবেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পাঠকের হৃদয় সিংহাসনে চিরকালের জন্য স্থান করে নিয়েছেন। 'বহিপীর' (১৯৬০), 'তরঙ্গ ভঙ্গ', (১৯৬৪), সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪), 'উজানে মৃত্যু' (১৯৬২) প্রভৃতি নাটকগুলি 'সমকাল' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাটকগুলি নবযুগোপযোগী নাটক হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়াও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আরও একটি বড়ো পরিচয়— বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। তাঁর লেখা ছোটগল্প গ্রন্থ দুটি হল— 'নয়নচারা' (১৯৪৪), 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫)। ছোটগল্পের অবিসংবাদী শৈল্পিকতার নিপুণ রূপকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। স্বার্থপুষ্ট রাজনীতি একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুষের সামাজিক ভিত কীভাবে নড়িয়ে দিতে পারে—তারই মর্মান্তিক অক্ষরের গল্পরূপ দিয়েছেন গল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। 'জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী' এই বেদবাক্য মনে রেখেও ১৯৪৭ এর দেশভাগ বাঙালি জনমানসে এখনও এক আতঙ্কে কেঁপে ওঠা অসমাপ্ত স্বপ্ন যেন ! হাতের মুঠোয় প্রাণটাকে নিয়ে রাতারাতি একঘণ্টা বা বিনা নোটিশে মা মেয়ের ইজ্জৎ আব্রু মান-সম্মান প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আজন্মলালিত জন্ম ভূখণ্ড ছেড়ে নদী খাল বিল জঙ্গল ডিঙিয়ে, রক্তের নদী পেরিয়ে অনিশ্চিত ভূখণ্ডের দিকে পা বাড়ানো মানুষের মর্মান্তিক দিনগুলির কথা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবন্ত করে করে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পে। ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে হলেও আবেদনের অসীম লক্ষ্যে তাঁর গল্পের ছায়াপথ মানব হৃদয়ে দাগ রেখে গেছে। সাতচল্লিশের দেশভাগ তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ফলে শহরে গ্রামে নিরন্ন মানুষের ভুখমিছিল, পাশাপাশি একশ্রেণির মানুষের অমানবিক হিংস্র, পাশবিক আচরণ সভ্যতাদর্পী মানুষের মাথা হেঁট করে দেয়। পিশাচরূপী নরপুঙ্গবদের উলঙ্গ রূপ তাঁর ছোটগল্পের শব্দে শব্দে কায়াময় করেছেন। আসলে মানবের মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কলঙ্কিত মুখটিকেই ছোটগল্পকার তুলে ধরতে চেয়েছেন।

সূচক শব্দ: *‘নয়নচারা’, ‘মৃত্যুযাত্রা’, ‘খুনি’, ‘রক্ত’, ‘খণ্ড চাঁদের বক্রতায়’, ‘সেই পৃথিবী’, ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’।*

মূল প্রবন্ধ :

বাংলা সাহিত্য জগতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একাধারে ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও ছোটগল্পকার। শুধু ওপার বাংলার নয় আমাদের এপার বাংলাতেও তিনি একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ (১৮৪৮), ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪), ‘কাঁদো নদী কাঁদো’ (১৯৬৮) নামের তিনটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আমাদের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আধুনিক উপন্যাসের নতুন নতুন বৈশ্বিক প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল অস্তিত্ববাদী, চেতনাপ্রবাহ রীতি পদ্ধতির সুচারু প্রয়োগে এই উপন্যাস সাহিত্যকে আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা নবদিগন্তের অর্গল খুলে দিয়েছেন। একজন নাট্যকার হিসেবেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পাঠক এবং দর্শকের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। ‘বহিপীর’ (১৯৬০), ‘তরঙ্গভঙ্গ’, (১৯৬৪), সুড়ঙ্গ’ (১৯৬৪), ‘উজানে মৃত্যু’ সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, (১৯৬২) প্রভৃতি নবযুগোপযোগী নাটক তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে। শুধু তাই নয়— বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি সর্বাধিক পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর লেখা ছোটগল্প গ্রন্থ দুটি হল— ‘নয়নচারা’ (১৯৪৪), ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ (১৯৬৫)। দেশভাগ, ধর্ম, রাজনীতি, মানব জীবনের নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক সংকট এবং সভ্যতার সংশয়কে তিনি তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাস ছোটগল্প বা নাটকের মূল বিষয় করেছেন।

ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘সওগাত’ পত্রিকার পাতায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে, ‘চিরন্তন পৃথিবী’ নামের ছোটগল্প দিয়ে। ‘নয়নচারা’ (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থের মধ্যে মোট আটটি গল্প গ্রন্থিত ছিল, সেগুলি হল— ‘নয়নচারা’, ‘জাহাজি’, ‘পরাজয়’, ‘মৃত্যুযাত্রা’, ‘খুনি’, ‘রক্ত’, ‘খণ্ড চাঁদের বক্রতায়’, এবং ‘সেই পৃথিবী’। আর ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থে পাওয়া যায়— ‘দুই তীর’, ‘একটি তুলসীগাছের কাহিনী’, ‘পাগড়ি’, ‘কেরায়া’, ‘নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা’, ‘গ্রীষ্মের ছুটি’, ‘মালেকা’, ‘স্তন’ এবং ‘মতীনউদ্দিনের প্রেম’ নামের হীরকদ্যুতিময় ছোটগল্প। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভাল যে, ১৯৭২ সালে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মৃত্যুর পর কলকাতা থেকে ‘নয়নচারা’ এবং ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’ গ্রন্থ থেকে সতেরোটি ছোটগল্প নিয়ে একটি পৃথক সংকলন প্রকাশ করা হয়। এরপর ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আকরম হোসেনের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী’-তে মোট ৩২টি ছোটগল্প রাখা হয়। হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত ‘গল্পসমগ্র: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা- ১১০০, ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে ‘নয়নচারা’, ‘দুই তীর ও অন্যান্য গল্প’, এবং ‘অগ্রন্থিত গল্পাবলি’ শিরোনাম দিয়ে সেখানে আরও দশটি গল্প সংযোজন করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্পের সর্বশেষ এই সংকলন সম্পর্কে জানা যায়— কলকাতার চিরায়ত প্রকাশনী ২০০১ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সরকারের সম্পাদনায় ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’-র ‘গল্পসমগ্র’ প্রকাশ করেছিল। এ পর্যন্ত এটিই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সমস্ত গল্পের সমষ্টি বলে ধরে নেওয়া হবে। এই ‘গল্পসমগ্র’-র ভূমিকায় পবিত্র সরকার লিখেছিলেন— “আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত ‘সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’ গ্রন্থে যোগ করেছেন আরও একটি গল্প (‘অরূপ’), আর গবেষক বন্ধুরা যোগ করেছেন ওই ‘অরূপ’ ছাড়াও আরও একাধিক গল্প যেগুলির সন্ধান অন্যরা দিতে পারেন নি। ফলে আমাদের ‘গল্পসমগ্র’ আপাতত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-র গল্পের এক পূর্ণাঙ্গ সংকলন বলা যায়।”[১]

বিষয় বিবেচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'-র 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিকে মোটাদাগের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে লেখা বিশেষ কিছু গল্প, এগুলির মধ্যে রয়েছে— 'নয়নচারা', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'রক্ত' এবং 'সেই পৃথিবী' এই চারটি গল্প। আর

(খ) নদীকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার মানুষদের জীবনের চালচিত্র হাসি-কান্না, আশা-ভালবাসার বাস্তব কাহিনির অশ্রুসজল গল্পরূপ, এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে পড়ে— 'জাহাজি', 'পরাজয়', ও 'খুনি'।

'নয়নচারা' (১৯৪৪) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত প্রথম গল্প অথবা নাম-গল্প বলতে যা বোঝায় সেই গল্পটিতে ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি গল্পকার তুলে ধরেছেন। এই গল্পে আমু, ভুতো, ভূতনি প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মহা-মন্বন্তর ক্ষুধা-পীড়িত রোগাক্রান্ত সময় ও মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট অসহায় অবস্থার নির্মম ছবি অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে অক্ষরে অক্ষরে তুলে ধরেছেন। ময়ুরাক্ষী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গল্প-নায়কের গ্রাম, সেই গ্রামের নাম 'নয়নচারা'। তাহলে পাঠকের কাছে গল্পের নামকরণ নিয়ে প্রথম দ্বন্দ্ব কেটে গেল। এই গল্পটি আসলে একটি স্থান-নাম কেন্দ্রিক গল্প। 'নয়নচারা' একটি গ্রামের নাম, যে গ্রামটি ময়ুরাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত। ছোটগল্পের নামকরণের হাজারও জটিল সূত্র বা অভিব্যঞ্জনা থাকলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এই গল্পে একটি সাদা-মাঠা গ্রামের নামকেই তাঁর গল্পের শীর্ষনাম হিসেবে বিবেচনা করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এই গ্রাম এবং এই গ্রামের প্রতিটি মানুষের মধ্যে মায়া মমতা প্রীতি ও ভালবাসার যেমন সুদৃঢ় বন্ধন ছিল তেমনি ছিল পারস্পরিক একতা, মানবিকতার বিছানো বাগান। কিন্তু একদিন বাধ্য হয়ে খাদ্যাভাবে সেই ভালবাসার নির্মলগ্রাম ছেড়ে ভূতনী এবং ভূতোকে কলকাতা শহরে চলে আসতে হয়— দুর্ভিক্ষের কারণে। এই কলকাতা শহরে এসে তারা মানুষের মধ্যে অনুভব করে মনুষ্যত্বহীনতা। হৃদয়হীন শহরের মানচিত্র জুড়ে আছে শুধু কংক্রিট, ইট, পাথর, লোহা-লক্কর। বড় বড় ইমারত, যেখানে মানুষ আছে, যন্ত্রের সঙ্গে— যন্ত্র হয়ে। মানুষই হয়ে উঠেছে যন্ত্রের নামান্তর। ধাতব পদার্থ দিয়ে গড়া যন্ত্র তা যতই মানুষের উপকারে আসুক না কেন, সেই ধাতব পদার্থের মধ্যে কোথাও সহানুভূতির চিহ্নমাত্র থাকবে না। যন্ত্রের সঙ্গে দিনরাত লেপ্টে থাকা মানুষ তাদের মনুষ্যত্বকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়ে ফেলেছে। এই শহরের লোকজন কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে থাকা কোন পশুতে পরিণত হয়েছে। তাদের মধ্যে কোন রকম দয়া-মায়া বা ভালোবাসা নেই। আর এই শহরে এসে ভূতনী আর তার ভাই ভূতো না খেতে পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই প্রসঙ্গে গল্পকার উল্লেখ করেছেন— "ময়রার দোকানে মাছি বোঁ বোঁ করে। ময়রার চোখে কিন্তু নেই ননী কোমলতা, সে চোখে পাশবিক হিংস্রতা। এত হিংস্রতা যে মনে হয় চারধারের ঘন অন্ধকারের মধ্যে দুটো ভয়ঙ্কর চোখ ধক ধক করে জ্বলছে।" গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন এই শহরের ময়রার দোকানদার, তার মধ্যে কোন দয়ার ছায়া মাত্র নেই, তার মধ্যে রয়েছে কেবল হিংস্র পশুর মত হিংস্রতা। এবং এই দোকানের ভেতরে রয়েছে নানা সুস্বাদু খাবার, তার ওপর মাছি ভন ভন করেছে এবং একটি কাঁচে ঢাকা আর ওপারে রয়েছে রাস্তা, ক্ষুধার্ত আমু, ভূতো, ভূতনি। তাদেরকে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। কিন্তু তার মধ্যে পথচারী লালপেড়ে শাড়ি পরা খোলাচুলে থাকা একজন নারী তার রক্ত ঝলসিয়ে দুটো পয়সা দান করে। আর এই নারীর মাথাভর্তি চুল দেখে আমু মনে করে এ যেন তাদের নয়নচারা— 'গ্রামের মেয়ে ঝিরার মাথার ঘন কালো চুল'। যার মধ্যে মমতাময়ীর ছায়া পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুদিন পরে ভূতনীর ভাই ভূতো অনাহারে মারা যায় এবং ভূতনীও কাশতে কাশতে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। শুধু

তাই নয় আমু রাস্তায় চলতে চলতে দেখে যে রাস্তার দুধারে দোকানে সুন্দর হলুদ রঙের সুস্বাদু কলা, এ যেন কলা নয় হলুদ স্বপ্ন। এই প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন— "ওধারে একটা দোকানে যে ক কাঁড়ি কলা ঝুলছে সেদিক পানে চেয়ে তবু চোখ জুড়ায়, ওগুলো কলা নয় তো, যেন হলুদ রঙা স্বপ্ন ঝুলছে।" এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমু একদিন একটি বাড়ির দরজায় টোকা মারে। সেই ঘর থেকে একজন নারী বেরিয়ে আসে এবং সে তাদের একথালা ভাত এনে দেয়। কারণ এই দুর্ভিক্ষের বাজারে তারও বেশি কিছু দেওয়ার সামর্থ্য নেই। এখানে একজন নারী হয়ে অন্য একজন নারীর দুঃখ আর আর ক্ষিদের তাড়না বুঝতে পারে। এই গল্পে এই প্রথম এক নারী তার রক্ত ঝলসানো পয়সা ক্ষুধার্তকে দান করেন আর এই নারী যে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু খাবার তাদের দান করে। এই পুরুষশাসিত সমাজে কোন পুরুষের মধ্যে এই দুঃখী, পীড়িত ও ক্ষুধার্ত মানুষের ওপর দয়ার হাত বাড়িয়েছে তা দেখতে পাওয়া যাওয়া না। তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব নয়— হিংস্র পশুর মতো হিংস্রতা দেখা যায়। এভাবেই আমুর না খেতে পাওয়া, দুর্ভিক্ষে থাকা মানুষের মৃত্যুর উপত্যকা গল্পকার দেখিয়েছেন। গ্রামকে গ্রাম শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে— "ময়ুরাক্ষী তীরে কুয়াশা নেবেছে। স্তব্ধ দুপুর: শান্ত নদী। দূরে একট নৌকার খরতাল ঝন ঝন করছে। আর এধারে শ্মশানঘাটে মৃতদেহ পুড়ছে।"[২] ছায়াহীন, গাছহীন কলকাতা শহরের অসহ্য রোদের মধ্যে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে আমুর বার বার মনে হয়েছে তার প্রিয় নয়নচারা গ্রামের কথা। নয়নচারা গ্রামের ছায়াঘন স্বপ্নের শীতলপাটি বিছানো মায়াতুর স্মৃতিমেদুর হাতছানি তাকে বিব্রত করে। বর্তমানের নিদাঘ রুক্ষতায় যেন মায়াবী আলো দোলা দিয়ে যায়। তার কাছে বর্তমান আর অতীত এর সীমারেখায় উৎকটভাবে ধাক্কা দিয়ে যায়। শহর এবং বর্তমান সময়ের নির্মমতার মধ্যে তার মন বার বার নয়নচারা গ্রামে ফিরে যেতে চাইছে—এক অদ্ভুত নিরুপায় অবস্থার নির্মম চিত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর এই গল্পে তুলে এনেছেন। স্বগার্দপি গরিয়সী জন্মভূমি আমুর নয়নচারা গ্রাম স্বর্গীয় অনুভব নিয়ে স্মৃতিমেদুর অশ্রু-আর্দ্র ঝাপসা চোখ কেবল গল্পের পাত্র-পাত্রীর কণ্ঠ ভারাক্রান্ত করে না—পাঠকের চোখের কোণেও জল চিক চিক করে ওঠে। একজন কালজয়ী ছোটগল্পকারের গল্পাবেদন এভাবেই দেশ-কাল অতিক্রম করে যে কোন পাঠকের হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। এই প্রসঙ্গে সমালোচকের জীবননিষ্ঠ মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য—"অন্তর্বাস্তবতা ও বহির্বাস্তবতা এই গল্পে স্পাইরাল নকশায় বিধৃত। বহির্বাস্তবে আছে ১৩৫০-এর ভয়াবহ মন্বন্তর, অন্তর্বাস্তবে আছে স্নিগ্ধ, পল্লবঘন ময়ুরাক্ষী নদীতীরবর্তী নয়নচারা গ্রামের সুশান্তি।"[৩]

'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত আর একটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত সময়ের চিত্রলেখা উঠে এসেছে— 'মৃত্যু-যাত্রা' নামক ছোটগল্পে। এইগল্পে খুব স্পষ্টভাবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া ঘন কালো ডানা মেলেছে। গল্পের নামকরণ থেকেই আমাদের অনুভবে জেগে ওঠে— এ মৃত্যুর পদানুসরণ প্রক্রিয়া। মৃত্যুর দিকে যাত্রা। 'জন্মিলে মরিতে হবে/ অমর কে কোথা কবে?'—এ মৃত্যু যাত্রা সেই মৃত্যু যাত্রা নয়। ১৩৫০-এর সর্বাত্মক দুর্ভিক্ষে বাংলার গ্রামকে গ্রাম শ্মশানে পরিণত করেছিল। অসুখে বিসুখে, অনাহারে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর মরণান্তিক তাগিদ আমাদের বাংলাদেশ সেদিন মারাত্মক অক্কা পেয়েছিল। গ্রামের কৃষিকেন্দ্রিক, কৃষিজীবী মানুষেরা খরা-বন্যায় ফসল অজন্মাজনিত কারণে পড়েছিল চরম খাদ্যাভাবে। গ্রাম থেকে মানুষেরা বাড়ি ঘর ছেড়ে শহরের দিকে ছুটে আসছিল— প্রাণের দ্বীপশিখাকে কোনরকমে প্রজ্জ্বলিত রাখতে। কিন্তু এর ফল হয়েছিল আরও খারাপ। 'নয়নচারা' ছোটগল্পে এই দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের আর্ত-ক্রন্দন, গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে নির্দয় শহরে ইট-কাঠ, বড়-বড় ইমারতের সামনে দাঁড়িয়ে

হতভাগ্য মানুষ সেদিন ঈশ্বরকে শাপ-শাপান্ত করেছে, আর নিজের অদৃষ্টকে গালি দিয়েছে। 'মৃত্যু-যাত্রা' সেই দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর পটভূমিকায় লেখা একটি গল্প, আমাদের ফেলে আসা বাঙালি মানব ইতিহাসের এক নির্মম অধ্যায়। এই গল্পে গল্পকার কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি-চরিত্রের নাম উল্লেখ করেন নি। 'একদল মানুষ' এইগল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। খেতে না পাওয়া অভুক্ত মানুষ, দল বেঁধে জীর্ণ শীর্ণ মানুষ বেরিয়ে পড়েছে খাদ্যের সন্ধানে। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হয়, এই মানুষেরা খাদ্যের সন্ধানে বের হয়েছে—কিন্তু আসলে বের হয়েছে মৃত্যুর সন্ধানে, মৃত্যুর দিকে। গল্পের নামকরণের এই বিন্দুদর্শিত সিন্ধুদর্শন পাঠককে গল্পের শুরুর অংশটি পড়লেই পরিষ্কার হয়ে যায়—"অন্ধকারে সেখানে দৃষ্টি চলে না, শুধু রাতের স্তব্ধতায় সে—সে অন্ধকার থেকে নাক ডাকার ভারি একটানা আওয়াজ ভেসে আসছে—এদিকে যেখানে একদল মেয়ে-পুরুষ জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে নিসচলভাবে। তারা ঘাটে এসে পৌঁছেছে ঘন্টাখানেক আগে। খেয়া এখন বন্ধ, ভোর না হলে তাদের পার হবার উপায় নেই। বসে থেকে-থেকে কারো চোখ ভরে উঠেছে ঘুমে, কারো চোখ অবসাদে বোজা, আর যাদের চোখ খোলা—রাতের অন্ধকারে তাদের সে-চোখের পানে তাকালে মনে হবে, মৃত্যু তাকিয়ে রয়েছে কালো জীবনের পানে।"[৪] 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পটি সম্পর্কে পূর্বাশা পত্রিকায় শৈলেন ঘোষ একটি আলোচনায় আমাদের বাংলা ছোটগল্পে মন্বন্তরের ওপর লেখা বিখ্যাত ছোটগল্পকারের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পটি যে এক এবং অন্যতমের মধ্যেও শীর্ষস্থানে থাকবে সেকথা অকপট জানিয়েছিলেন এবং তিনি উল্লেখ করেছেন—" ...ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের আর কোন রচনা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না, এই একটিমাত্র গল্প তাঁকে বাংলা সাহিত্যের বেদীতে আসন দিয়েচে।"[৫] কাজেই বলতে আর দ্বিধা থাকে না, যে মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে লিখিত বাংলা ছোটগল্প গুলির মধ্যে 'মৃত্যু-যাত্রা' অন্যতম একটি ছোটগল্প। মৃত্যু মানুষের জীবনের অনিবার্য একটি পর্ব—এই পর্বকে উত্তরণের প্রচেষ্টা সে করে না, কিন্তু দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তরের কবলে পড়ে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পৌঁছে যাওয়া মানবিকতার অবনমন ছাড়া আর কিছু না। আমরা জানি ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের পেছনে যতখানি ফসল অনুৎপাদন, খরা, বন্যার মতো সরাসরি প্রাকৃতিক কারণ দায়ী ছিল তার চেয়ে বেশি দায়ী ছিল ইংরেজ সরকারের তুমুল সম্পদ লুণ্ঠন-প্রয়াস। তারা বাংলাদেশের উন্নতি কোনদিন সেভাবে চায় নি, শোষণের এক প্রকৃষ্ট কলোনি হিসেবে বাংলাদেশকে তারা ব্যবহার করেছে। দিকে দিকে মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, মৃতদেহ দাহ বা দাফন করার মানুষ নেই, প্রতিটি ঘরে রাস্তা ঘাটে পথে প্রান্তরে মানুষের মৃত্যুর সার। গল্পের শেষাংশে গল্পকার মন্বন্তর আক্রান্ত-বুভুক্ষু মানুষের দলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন— যারা মন্বন্তরে না খেতে পেয়ে নিদারুণ কষ্টে মারা গেছে তারা আসলে 'শহীদ'। তারা এক অর্থে দেশের প্রতিছায়িত খাদ্যাভাবের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। গল্পকারের এই যুক্তিকে ছোট করে দেখার কোন কারণ থাকার কথা নয়। হাজুর বৃদ্ধ পিতা যে মরণাপন্ন, তাঁর আর চলার শক্তি নেই, তাকে ফেলে তার সঙ্গীরা কেউ চলে যেতে পারছে না। কারণ মানুষ এখানে নিজেরদের প্রয়োজনে যূথবদ্ধ। মানুষ এখন এখানে সকলেই একই সমস্যায় আক্রান্ত— আর তাই অপরের প্রয়োজনে ভবিতব্যে নিজেকে আড়চোখে দেখে নিয়ে সকলেই সকলের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং এতদিনের যাপিত সামাজিক রীতি-কর্তব্য মেনে চলাতে আত্মিকভাবে শান্তিলাভ করে। হাজুর বৃদ্ধ পিতা মরে গিয়ে তাদের সমস্যা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে খাবারের আশায় ছুটে চলা মানুষ আর পেছন ফিরে তাকায়নি, বেঁচে থাকার চকিত আভাসে তাদের সামাজিক রীতি নিয়ম, মৃতদেহ দাহ বা দাফনের পূণ্য কর্তব্যের কথা তাদের মনে হয়েছে। আর তাই তাদের মনে হয়েছে বৃদ্ধের মৃতদেহকে সৎকার করার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তত খবর দেওয়া যেতে পারে। একদিকে নিজেদের অস্তিত্বরক্ষার

মহাসঙ্কট অন্যদিকে মানবিক মহত্ব— গল্পকার একযোগে দুটি বিষয়কেই পাঠকের চোখের সামনে রেখেছেন। ধ্বংস এবং সৃষ্টি দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী কাজ হলেও পাশাপাশি হাতে হাত মিলিয়ে চলে। মৃত্যু যাত্রীর দল অনেক অনেক মৃত্যু দিয়ে এবার প্রাণে বেঁচে ওঠার একটা স্বপ্ন দেখতে পেয়েছে। অনেক মৃত্যু অনেক জৈবনিক লড়াইয়ের পর তারা বাঁচতে পারবে বলে একটা আশার আলো দেখতে পেয়েছে। আবার তারা নিজেদের গ্রাম ফিরে যাবে— মাঠে মাঠে ফসল ফলাবে, গোলা ভরে ধান তুলবে— এই স্বপ্ন, এই স্বপ্ন তাদের নতুন করে বাঁকানো শিরদাঁড়াকে টান টান করে দিয়েছে। গল্পের শেষচরণদ্বয়ে সাজুর মৃত বৃদ্ধ পিতাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন— "তারপর সন্ধ্যা হল, হাওয়া থামল, ক্রমে-ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। এবং প্রান্তরের ধারে বৃহৎ বৃক্ষের তলে তার গুড়িতে ঠেস দিয়ে বুড়োর মৃতদেহ বসে রইল অনন্ত তমিস্রার দার্শনিকের মতো।"[৬] 'মৃত্যু-যাত্রা' এই গল্পের সূচনা হলেও তা কিন্তু শেষ নয়—শেষ কথা নয়। গল্পকারের লেখনীজাদুতে 'মৃত্যু-যাত্রা' হয়ে উঠেছে নতুনের সূচনা, মুক্তি পথের যাত্রা, মৃত্যু হয়ে উঠেছে মুক্তির মন্ত্র। হাজুর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু মুক্তিরপ্রতীক হয়ে এই গল্পের অন্তর্শ্বাস এবং ব্যঞ্জনাকে ঘনপীনদ্ধ করেছে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত গৃহহারা বসতিহারা পরিজনহারা মানুষ সব কিছু হারাতে হারাতে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। সেই বিধ্বস্ত মানুষদের অতীত এবং আগামীদিনের ইঙ্গিত নিয়ে বসে থাকলেন প্রাচীন বৃদ্ধ, বৃহৎ গাছের গুড়িতে হেলান দিয়েছে— তিনি যেন অনন্ত তমিস্রার এক দার্শনিক— ক্লান্ত মানুষদের অভয় দিচ্ছেন— একদিন ঝড় থেমে যাবে।

রক্ত' নামের গল্পটি ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা হলেও আসলে একটি জটিল মনস্তত্ত্ব এই গল্পদেহে রাখা হয়েছে। গল্পের কাহিনি খুব অল্প, গল্পের নায়ক—আবদুল। এই আবদুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্মাপারের আবদুল মাঝি— ছুঁচলো দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া আবদুল নন। এই আবদুল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে অসহায়, কর্মহীন এক যুবক। বছর সাত সে এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে ঘুরে বেরিয়েছে। বর্তমানে তার শরীরের অবস্থা ভাল না, সে জেনেছে সাদা চামড়ার মানুষ আর খাকী পোশাক পরা মানুষেরা শুধু টাকা উপার্জন করছে, বলতা গেলে টাকা লুটে নিচ্ছে, কিন্তু আজ হতস্বাস্থ্য আবদুল মনে মনে স্থির করেছে—জাহাজের মালিকের কাছে তা বকেয়া টাকা বুঝে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে সে-ও টাকা লুটবে। এই অসহায় মানুষের স্বপ্ন গল্পের প্রাণ-ভোমরা, সন্দেহ নেই। ক্ষুধার্ত আক্কাশকে খাইয়ে, একসঙ্গে বিড়ি খেয়ে আজকের এই দুই বন্ধু— অনেকটা স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে হাঁটতে হাঁটতে আক্কাশের বাড়ি পৌঁছে যায়। বস্তিতে তাঁর ঘর। আক্কাশের ছেলে মেয়ে নেই, বউ আর সে-- এই দুটিতে সংসার। আবদুলকে আক্কাশ তাঁর বউ,বউয়ের মেজাজ ভাল না থাকা, মাঝে মাঝে বউকে ঠ্যাঙানোর মত প্রসঙ্গ বললেও আবদুলের সেদিকে মন ছিল না। কারণ সাত বছর আগে সে গ্রাম সমাজ প্রতিবেশি বন্ধু বান্ধবের মমত্ব ত্যাগ করে জাহাজে চড়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল—উপার্জনের আশায়। সেইদিন থেকে তার সমস্ত মমতার বন্ধন ছিন্ন হয়ে হৃদয়ের ভেতরে যে রক্ত ঝরছিল—আজও সেই রক্তের বহমান ধারা অব্যাহত। গভীর রাত্রে কাশতে কাশতে আবদুলের মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে— সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে। একসময় আক্কাশের বউ, আক্কাশ তাঁকে শুশ্রূষা করেছে, মাথায় হাওয়া দিয়েছে তাদের স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে তাকে সুস্থ করার জাগতিক সমস্তরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। "... এমন দিন কি কখনও আসবে যখন নিবিড় স্নেহমমতায় ডুবে গিয়ে সে বলতে পারবে যে, বিগত কোন একদা স্নেহভালোবাসাশূন্য প্রান্তরে তাঁর নিঃস্ব রিক্ত হৃদয় দিয়ে গলগলিয়ে রক্ত ঝরেছিল, রক্ত?"[৭] এই প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্প-সমালোচকের কথার সঙ্গে সায় দিতেই হয়। 'রক্ত' গল্পের গঠনে বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি থাকলেও সেই

পটভূমি আক্রান্ত সাধারণ মানুষের জীবনকে হতাশার সমুদ্র সফেনে ভরিয়ে দিয়েছিল— তারই নিদারুণ অক্ষরচিত্র ফুটে উঠেছে। সর্বোপরি গল্পটি মানবিক চেতনার রন্ধ্রপথে স্নেহ-প্রেম-প্রীতিরই সুপ্ত অস্তিত্বকেই যেন পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছেন গল্পকার। সমালোচক জানিয়েছেন— ''রক্ত' সেই সূত্রে হতাশার আখ্যান, হতাশার বৃত্তান্ত, অসহায়তার রক্তলেখা। নিঃসঙ্গতা, কর্মহীনতা, রোগাক্রান্ত শরীর এ-গল্পে জীবনের স্বাভাবিক যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছে। বাঁচার প্রয়োজনে যে স্নেহ, ভালোবাসা, বন্ধন কত জরুরী তা প্রমাণ হয়েছে আরও একবার। পরোক্ষে মাতৃস্নেহ আর বিবির ভালবাসা সমার্থক হয়ে গেছে।''[৮]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'-র 'সেই পৃথিবী' নামের গল্পেও বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি গল্পের মূল প্রাণকেন্দ্রে থাকলেও সেই নিষ্প্রাণ কালো কুৎসিত অমানিশার মধ্য থেকে চেতনার শুভবোধকে জেগে উঠতে দেখেছেন গল্পকার। কোন মানুষ বাইরে থেকে দেখতে কুৎসিত, ভীষণ দর্শন, কালো হলেও তার মধ্যে শুভোদ্দীপক মানবিক ব্যবহার শিখা জ্বলে উঠতে পারে। দেখতে কুৎসিত বলেই সে ঘৃণার নয়, তার মনের মধ্যেও সৌন্দর্য অনুভবের প্রাণতা আছে— তা হয়তো আমরা অনেক সময় খেয়াল রাখিনা। এই গল্পের সাদেক নামের নায়ক-পুরুষ, বেঁটে খাটো চেহারা, লোমশ দেহ, ট্যাঁরা চোখ, একেবারে কদর্য ও শ্রী-হীন। সে একজন চোর। রাস্তাঘাটে মানুষ দেখলে সে প্রথমে দেখে সেই মানুষের নারী হোক বা পুরুষ হোক—তার শরীর কী কী অলঙ্কার আছে, হাতে সোনার চুড়ি আছে কী না, অথবা আংটি, গলায় মালা আছে কী না? এইরকমই একদিন চুরি করতে গিয়ে তার চোখে পড়ে অদ্ভুত এক দৃশ্য, মা সন্তানকে তার বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে ঘুমিয়ে পড়েছে, সন্তানও ঘুমিয়ে পড়েছে— হঠাৎ সন্তানের ঘুম ভেঙে গেলে মা আবার তাকে দুগ্ধপানে সহায়তা করেছে— মা ঘুম জড়ানো চোখে মৃদুস্বরে গান গেয়ে গেছে। একজন কদর্য চোর সে এইরকম একটা দৃশ্য দেখে তার মনের মধ্যে অভাবনীয় সৌন্দর্যের উৎসরণ ঘটে গেছে— জন্ম নিয়েছে নৈসর্গিক লহমা। সেই আধ-ঘুমে বিজড়িত মাতৃ-মুখের গানের সুরেই সে চোর স্বর্গসুখ লাভ করেছে। তার কাছে মনে হয়েছে— পৃথিবীটাই স্বর্গ। শুভবুদ্ধির জাগরণে হৃদয় সত্যের উন্মোচনই এই গল্পের মূল কথা। আর এইরকম একজন চোর সম্পর্কে গল্পকার লিখেছেন— ''তবু, লোকটার অন্তর আছে। মানুষের নাকি অন্তর আছে, এর-ও আছে তা। ওর লোমশ নোংরা কালো দেহের অন্তরালে কোথায়, কে জানে, একটা নরম কোমল অন্তর লুক্কায়িত, এবং এর পরিচয়ে অবাক হবার-ই কথা।''[৯] আমরা পাঠকেরা সত্যিই অবাক হয়েছি, কদর্য মানুষের ভেতরের কদর্যতা ঠেলে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যে কোন সময়েই সৌন্দর্যের স্বর্গাসনে উত্তরিত হতে পারে।

ছোটগল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের আরও একটি ছোটগল্প 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'। এটি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গ্রন্থের অন্তর্গত একটি প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটগল্প। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রেক্ষাপটকে পটভূমিতে করে এই গল্প রচিত। দেশভাগের ফলে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ— একটি হিন্দু আর অন্যটি মুসলমান সম্প্রদায় তাদের জাতিগত পরিচয়ের পরকাষ্ঠা কত বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছিল তারই বেদনাক্ষুব্ধ প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। এই ধর্ম বিভিন্ন মানুষের আসল পরিচয় মানুষ, তবু তারা সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক পালাবদলের কুশীলব তারা, সময়ের হাতে ক্রীড়নক। দেশপ্রধানেরা দুই ধর্মের মানুষের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র-- পাকিস্তান এবং ভারত চায়। তখন প্রাণের ভয়ে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলো তাদের নিজ নিজ ধর্মের মানুষের কাছে যেতে নিজের ভিটেমাটি ত্যাগ করেন। নিজের বাস্তু ছেড়ে অজানা অচেনা দেশে আশ্রয়হীন হয়ে যে তুমুল অশান্তি

অনিশ্চয়তা ভোগ করেছিল— সেই মর্মন্তুত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পকার 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পটি রচনা করেছেন। এই গল্পের প্রধান চরিত্রগুলি হল— মতীন (যার বাগান খুব প্রিয়), ইউনুস (সে খুব রোগা পটকা), মোতাব্বের (হুজুগে মানুষ), কাদের, (সে খুব গল্প ভালোবাসে), হাবিবুল্লাহ (যে খুব গান পছন্দ করে), এ নায়েৎ (মৌলভী), বদরুদ্দিন, আমজাদ (হুকাপ্রিয়) এবং মকসুদ, (যে বামপন্থী রাজনীতির মত ও পথের পক্ষাবলম্বী)। ব্লকম্যান লেনে খালাসীপট্টি, বৈঠক খানার দপ্তরিপাড়া, ম্যাকলিঞ্জ স্ট্রিটে, সৈয়দ সালেহা লেনে, তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নোংরা দুর্গন্ধে থাকা মতিন, বদরুদ্দিন, ইউনুস, মোতাব্বের, এনায়েত, মকসুদরা সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়ের দিনে বাস্তুহারা হয়ে পড়ে। একটা বেওয়ারিশ বাড়ির তালা ভেঙে তারা নিজেদের থাকার জন্য একটা আশ্রয় খুঁজে নেয়। আর এই বাড়ির মালিকেরা অন্য কোথাও থাকার জন্য আশ্রয় পেয়েছে কী না, সে সম্পর্কে গল্পকার কিছু বলেন নি। তবে অনুমান— তারাও কোন একটা আশ্রয় হয়তো খুঁজে পাবেন। তবে গল্পে উল্লিখিত চরিত্ররা যে একটা আশ্রয় পেয়েছে— এতেই তাদের চোখে স্বপ্ন রঙিন দিনের ইশারা ঝিলিক দিয়ে গেছে। আশ্রয়হীন মানুষেরা আশ্রয় পেয়েছে। ধীরে ধীরে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে, পছন্দমতো বাগান বাড়ি, মজলিস, খাওয়া-দাওয়া আয়েসে দিন গুজরানের মধ্যেই এই বাড়িতে একটি তুলসী গাছ তাদের নজরে পড়েছে। তুলসী গাছ— হিন্দুয়ানির প্রতীক এবং এই বাড়ির পূর্বতন মানুষেরা যে এই ধর্মের মানুষ ছিল তা নিয়ে আগন্তুক পরিবারের আর সন্দেহ থাকে না। এবার এই গাছটিকে কেউ উপড়ে ফেলতে চায়— কেউ মানে তাদের মধ্যে যারা সবুজপ্রেমী, বৃক্ষপ্রেমী তাদের কাছে ব্যাপারটি এটি একটি গাছ বৈ অন্য কিছু নয়। তা সে ফণীমনসা গাছ হোক, নয়তো বা তুলসীগাছ হোক। একটি গাছকে গাছ হিসেবেই দেখার উদার মানসিকতায় তারা বিশ্বাসী। তুলসীগাছের মধ্যে দিয়ে বাস্তুহারা মানুষের আশাবাদ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অনুভব করিয়েছেন। গল্পকার প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিয়েছেন— দেশভাগ মানুষকে বাস্তুহারা করেছে, আশ্রয়হীন করেছে— কিন্তু প্রাণে মেরে ফেলেনি। তুলসী গাছের বিবর্ণ পাতার রূপকল্পের মতো কেবলই প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে মাত্র। গল্পে আবার দেখা গেছে সরকারি লোক (পুলিশ) এসে একদিন বাড়িটি নিজেদের হেফাজতে রাখতে চেয়েছে, তাদের অন্যত্র উঠে যেতে বলেছেন। তখন আবার নতুন করে এই আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে বেদনার কালো মেঘ ঘনছায়া ফেলেছে। এবার তারা কোথায় যাবে? জল না পেয়ে তুলসী গাছের মতো তারাও নিরাশ্রয় মানবিক অভাবে শুকিয়ে যাবে। তুলসীগাছ প্রাণোজ্জ্বল জীবনের প্রতীক, কোন ধর্মীয় আবরণ নয়। জীবনে উচ্ছ্বলতা নিয়ে বেঁচে থাকাটাই সকল মানুষেরই কাম্য। কুসংস্কার বা ধর্মান্ধতা মানুষের মানবিকতার কাছে হার মেনে যায়। মানবিকতা ধর্ম দেখে না, জাত দেখে না। তুলসীগাছের গোড়ায় জল না দিলে সে মরে যাবে—মানুষের মধ্যে থেকে মানবিকতা উবে গেলে সেই মানুষেরও মৃত্যু অবধারিত। সাম্প্রদায়িক হানাহানির কবলে পড়েও জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে উঠে প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার বার্তাই আমরা এই গল্পে দ্যোতিত হতে দেখি। গল্পের শেষে গল্পকার মোক্ষম এক প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেছেন— আপামর মানুষের মানবিকতার দরবারে "উঠোনের শেষে তুলসীগাছটা আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রং। সেদিন পুলিশ আসার পর থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয় নি। সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি। কেন পড়েনি সে-কথা তুলসীগাছের জানবার কথা নয়, মানুষেরই জানবার কথা।"[১০] গল্প শেষ হয়ে যায় কিন্তু তার রেশ যায় না। আমাদের চেতন ভাণ্ডারের প্রতিটি কোষ এই গল্পকে শেষ হতে দেয় না। গল্পের ব্যঞ্জনা আমাদের স্মৃতিকে তছনছ করে— আমাদের বিবেককে আঘাত করে। বাস্তবিক পরিস্থিতির অগ্নিভূমে দাঁড়িয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গল্পের প্রতিটি চরণ প্রতিটি শব্দ আমাদের চেতনায় ধাক্কা মারে।

সূত্র নির্দেশ:

১। পবিত্র সরকার, সম্পাদনা, ভূমিকা, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: গল্পসমগ্র', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ-৬

২। পবিত্র সরকার, সম্পাদনা, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: গল্পসমগ্র', 'নয়নচারা', চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১,পৃ-৫

৩। আবদুল মান্নান, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ', অবসর, ঢাকা, ২০০১, পৃ-১৭

৪। হায়াৎ মামুদ, সম্পাদনা, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: গল্পসমগ্র', 'মৃত্যু–যাত্রা', প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা- ১১০০, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ-২১

৫। আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ', প্রবেশক, অবসর, ঢাকা, ২০০১

৬। হায়াৎ মামুদ, সম্পাদনা, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: গল্পসমগ্র', 'মৃত্যু–যাত্রা', প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা-১১০০, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ-২৮

৭। হায়াৎ মামুদ, সম্পাদনা, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: গল্পসমগ্র', 'রক্ত', প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা-১১০০, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ-৪০

৮। জীনাত ইমতিয়াজ আলী, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম', নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১,পৃ-২৫৬

৯। হায়াৎ মামুদ, সম্পাদনা, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: গল্পসমগ্র', 'সেই পৃথিবী', প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা- ১১০০, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ-৪৪

১০। হায়াৎ মামুদ, সম্পাদনা, 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ: গল্পসমগ্র', 'সেই পৃথিবী', প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা-১১০০, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ-৭১

Citation: **বিশ্বাস. স্বা.,** (2024) "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্পে— দেশভাগের যন্ত্রণা আর বাংলার মন্বন্তরের মর্মভেদী সুর", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-11, December-2024.